চিন্তনে মননে বিবেকানন্দ সঙ্গীত

পৃথ্বীরাজ সেন

পুনশ্চ

অবতরণিকা

স্বামী বিবেকানন্দ সর্বক্ষণের সঙ্গীত সাধক ছিলেন না, তাঁকে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। ভারত পথিক পরিব্রাজক এই সন্ন্যাসী একাধিকবার পাশ্চাত্য দেশে পদার্পণ করেছিলেন। সীমায়িত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ইতিবাচক এবং সদর্থক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনের সাধনাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবো। একজন মানুষ কিভাবে জীবনের প্রতিটি প্রহরকে শুভবোধক কাজে নিয়োগ করতে পারেন, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন পর্যালোচনা করতেন আমরা তা স্পষ্ট বুঝতে পারবো। একাধারে তিনি ছিলেন অধ্যাত্ম মহাপুরুষ এবং কল্যাণকামী সমাজ-সংস্কারক। পরাধীন ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নতি কিভাবে হতে পারে তা নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার কোন অন্ত ছিল না। ভারতবর্ষের বুকে তিনি আধ্যাত্মিক অনুধ্যান সমৃদ্ধ সমাজ সংস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে ঐ স্বপ্ন সফল হয়নি। তবে তিনি ভারতবাসীর মনের মধ্যে ভবিষ্যতের যে রূপরেখা এঁকে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তা অনেকাংশে পরিস্ফুটিত হয়েছিল। বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে অনেক তরুণ মানব কল্যাণ কর্মে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

এই গ্রন্থটির মাধ্যমে আমি স্বামী বিবেকানন্দের স্বল্পালোকিত সঙ্গীত মানসিকতার ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। জোয়ারী কণ্ঠ ছিল তাঁর। অনেকবার তিনি তাঁর কণ্ঠ মাধুর্যের মাধ্যমে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় জয় করেছেন। বিশেষ করে আধ্যাত্মিক সঙ্গীত পরিবেশনে তাঁর কৃতিত্বের কথা সর্বজনবিদিত। তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে এমন এক অলৌকিক ঐশী শক্তি ছিল যা মহান সাধক রামকৃষ্ণদেবকে পর্যন্ত ভাবাবিষ্ট করে রাখতো। অনেক বিশিষ্ট বিদগ্ধ বাঙালী ছিলেন তাঁর সঙ্গীতের গুণমুগ্ধ সমঝদার।

তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একাধিক সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। সেই সঙ্গীতগুলির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য এবং বৈজ্ঞানিক অভিপ্সা লুকিয়ে আছে, এ বইটির মাধমে আমি তার একটি ইতিবৃত্ত আপনাদের সামনে তুলে দিতে চেয়েছি। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অনুধ্যান চিরকাল বাঙালীর মনন এবং মানসিকতাকে আকৃষ্ট করেছে। পরিবর্তিত পরিবেশের মধ্যেও তাঁরা চিরন্তন অধ্যাত্ম চিন্তনের প্রতিভূস্বরূপ বিদ্যমান আছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এই মণীষীদ্বয় যে নীরব বিপ্লব সংগঠিত করেছেন, তার তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একান্ত অনুগামী এক সাধারণ ভক্ত হিসাবে আমি বিবেকানন্দের গাওয়া গানগুলি বিচার বিশ্লেষণ করার দুরূহ প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিল। হযতো এই প্রয়াসে কিছু দোষত্রুটি থেকে যাবে, থাকাটাই স্বাভাবিক, যদি আপনারা ক্ষমাসুন্দর চোখে সেই ত্রুটিগুলি মেনে নেন তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

স্বামীজীর কণ্ঠে গীত সঙ্গীতগুলির রসমাধুর্য এবং সুরবৈচিত্র্যের কথা অন্য কোন বিদগ্ধ গবেষক হয়তো আলোচনা করবেন। আমি এই বইটির দুই মলাটের মধ্যে সেইসব গানের সার্বিক মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি। যদি এই গ্রন্থটি আপনারা সাদরে গ্রহণ করেন তাহলে আমার এই শ্রম সার্থক হবে বলে আমি করি।

ধন্যবাদান্তে

পৃথ্বীরাজ সেন

৯ই আগস্ট। ২০১৭

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত মানস

স্বামী বিবেকানন্দ মন্ত্রিত কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং ধর্ম সভায় উদাত্ত কণ্ঠস্বরে অধ্যাত্ম সঙ্গীত পরিবেশন করে এক স্বর্গীয় পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছেন। বিবেকানন্দ তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে ভারত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিককে স্পর্শ করেছিলেন। সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা আমাদের অবাক করে দেয়। অধ্যাত্ম পুরুষ এবং সমাজ সংস্কারক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এইভাবে মানব মনীষার বিভিন্ন দিকগুলিকে আত্মস্থ করেছিলেন। সঙ্গীত সাধনা ছিল তাঁর ঈশ্বর সাধনার এক অন্যতম অঙ্গ। যদি আমরা নির্মোহ দৃষ্টিতে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো সঙ্গীত সেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। মধ্যযুগের একাধিক বিশিষ্ট সাধক-সাধিকা-সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করেছেন। এই তালিকাতে আছেন নানক, কবির, দাদু, তুলসীদাস এবং কৃষ্ণসাধিকা মীরাবাঈ। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের ইতিহাস অন্বেষণ করে আমরা যদি নারদ, ভরতমুনি প্রভৃতি ঋষির কথা আলোচনা করি তাহলে দেখবো তাঁরা সঙ্গীতকে ঈশ্বর আরাধনার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। তাই যুগ-যুগান্ত ধরে আমাদের মনে এই ধারণা চলে আসছে যে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার গভীর যোগসূত্রতা আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে আমরা ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের আকর গ্রন্থ বলে থাকি। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে মার্গ সঙ্গীতের বিস্তার এবং রূপরেখা সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচলিত আছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারবো কেন ভারতীয় শাত্ররকাররা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে ঈশ্বর অনুধ্যানের অন্যতম পাথেয় হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে সঙ্গীত হল এক অপূর্ব সুরসমৃদ্ধ সার্বিক শিল্প মাধমে যার সাহায্যে মানুষের মনে অনাস্বাদিত আনন্দের শিহরণ জাগানো সম্ভব। কিন্তু এই সঙ্গীতের মধ্যে একটি আলাদা রূপ বা প্রতীতি আছে। মার্গ সঙ্গীতের রাগ রাগিনীর আলাপ বা বিস্তার অংশে এক-একটি বিশেষ ভাব তার সমস্ত গাম্ভীর্য সহকারে ফুটে ওঠে। এই ভাবনার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার স্থান সবথেকে আগে বলা উচিত। যেহেতু যেকোন সঙ্গীতের মূল কথা হল রস আস্বাদন করা তাই সঙ্গীতের এই বিষয়টির প্রতিও নজর রাখা উচিত। শিল্পের সৌন্দর্যে যে রস-এর সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে অমৃতের স্বাদ-এর কোন তফাৎ নেই। তাই বলা হয়ে থাকে যে পরিবেশিত সঙ্গীত থেকে রসের যে

নিষ্পত্তি হয় তা অমৃতস্বাদের সহোদর। এই বিষয়টিকে বিচার বিবেচনা করেও আমরা ভারতীয় সঙ্গীতে আধ্যাত্মিকতার মূল্যায়ন করতে পারি।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত মানস প্রসঙ্গে নির্মোহ দৃষ্টিতে আলোচনা করলে এই বিষয়গুলি আমাদের মনে চলে আসে। আমরা ভাবি স্বামীজী কি সত্যিই সঙ্গীতের মাধমে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধন পথকে প্রশস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন? নাকি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার একটি দিক্ চিহ্ন স্বরূপ সঙ্গীত মানস সষ্টি হয়েছিল? তিনি যে কেবল সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তা নয়, নিজেও বেশ করে কটি অসাধারণ অধ্যাত্ম সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এছাড়া প্রভূত পরিশ্রম করে এমন একটি সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যার গ্রহণযোগ্যতা আজো একইরকম আছে।

গভীর বাস্তববাদী মননসমৃদ্ধ সমাজ-সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত সাধনার অন্তরালে ঠিক কোন কারণগুলি কাজ করেছে তা সম্পূর্ণভাবে জানা বোধ হয় সম্ভব নয়। তবে যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দকে কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা বলে থাকেন অতি শৈশব অবস্থা থেকে সঙ্গীতের প্রতি তাঁর একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ছিল। একেবারে বালক বয়সে স্বামীজী তন্ময় হয়ে পথের ভিখারীদের কণ্ঠ নিঃসৃত সুরেলা সঙ্গীত শুনতেন। কোথাও রামায়ণ গানের আসর বসলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছে যেতেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে বিবেকানন্দের সঙ্গীত শিক্ষার হাতে খড়ি হয়েছিল তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কাছে। বিশ্বনাথ দত্ত সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যখন তিনি কর্মোপলক্ষ্যে পশ্চিমাঞ্চলে থাকতেন তখন নানাজনের কাছে ঠুংরী, টপ্পা, গজল ইত্যাদি শিখেছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁর পিতার সঙ্গে বেশ কিছুদিন রায়পুরে কাটিয়েছিলেন। রায়পুরে থাকাকালীন তাঁর বৌদ্ধিক প্রতিভার বিকাশ ঘটে যায়। তখন তিনি পিতার কাছে বসে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত চর্চা করেন। অনেকে আবার তাঁর অন্যতম শিক্ষাগুরু হিসাবে বেণী ওস্তাদের নাম করে থাকেন। তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে স্বামীজী মাত্র চার বছর বিধিবদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। আবার অনেকে বলেন তিনি জীবনের অনেকগুলি বসন্ত সঙ্গীত চর্চায় অতিবাহিত করেছিলেন।

বিবেকানন্দের সাঙ্গীতিক প্রীতি এবং দক্ষতা বিশ্লেষণ করার আগে তাঁর সাঙ্গীতিক সৃজনশীলতা সম্পর্কে দু-চার কথা বলা দরকার। তখন তিনি সবেমাত্র বি.এ. পাশ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়াণের কয়েকমাস আগে শিবরাত্রি উপলক্ষে একটি অসাধারণ অধ্যাত্ম সঙ্গীত 'তাথৈয়া তাথৈয়া ভোলা নাচে' রচনা করলেন। এই সঙ্গীতে তিনি সুর সংযোজনা করেছিলেন এবং এটি মন্দ্রিত কণ্ঠস্বরে পরিবেশন করেছিলেন। তিনি ধ্রুপদাঙ্গের বেশ কয়েকটি গান রচনা করে সুর সংযোগে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্ঘের

প্রচারে ব্যাপৃত হন। এই প্রসঙ্গে আমরা এক বিদগ্ধ সঙ্গীতবিদ্ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের কথা বলব। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত মানস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন—'স্বামীজী ছিলেন না শুধুই সঙ্গীত শিল্পী, সঙ্গীত তত্ত্বানুসন্ধান ও — সঙ্গীত কল্পতরু গ্রন্থখানির ঔপপত্তিক আলোচনা শৈলীই তাঁর সঙ্গীত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার কথা প্রমাণ করে।'

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের এই মন্তব্যটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সত্যি সত্যি এমন একখানি গ্রন্থ সম্পাদনা করা খুব একটা সহজ কাজ নয়।

'সঙ্গীত কল্পতরু' বাংলা ভাষায় প্রথম সম্পূর্ণ এবং সুসংবদ্ধ সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থের মাধমে স্বামীজী একটি মহৎ কাজ-সমাপন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর সহযোগী ছিলেন প্রকাশক শ্রী বৈষ্ণবচরণ বসাক। গ্রন্থটি ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। সংকলক হিসাবে গ্রন্থের বিশেষ কথা অংশে বৈষ্ণব লিখেছিলেন—'শ্রীযুক্তবাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. মহাশয় প্রথমতঃ ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিশেষে নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমি ইহার অবশিষ্ঠাংশ পূরণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।'

এখানে একটি কথা বলা উচিত। তা হল এই গ্রন্থ প্রকাশের কালে নরেন্দ্রনাথ দত্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামী বিবেকানন্দ নামে আমাদের সামনে পরিচিত হয়েছেন। তাই এই সংকলন গ্রন্থটি তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। কিন্তু আমরা জানতে পারি না বৈষ্ণবচরণ মুলতঃ কতোটা কাজ করেছিলেন। এই গ্রন্থটি পাঠক মহলে এতোই জনপ্রিয় হয়েছিল যে ন' মাসের মধ্যে তিনটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকাশক বৈষ্ণবচরণ-এর ৪র্থ সংস্করণ বের করেন এবং নতুন নামকরণ করেন 'বিশ্ব-সঙ্গীত'। অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে তিনি তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি প্রয়োগ করে নরেন্দ্রনাথ দত্ত-র নামটি বাদ দেন। তবে প্রকৃত সঙ্গীতরসিকদের কাছে 'সঙ্গীত কল্পতরু'র মূল উদ্যোক্তা হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের নামটি আজো স্মরণীয় হয়ে আছে।

২০০০ সালে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গোলপার্ক থেকে 'সঙ্গীত কল্পতরু'র একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। নব কলেবরে প্রকাশিত এই সংস্করণের প্রথম সংস্করণের সমস্ত গীতাংশ অবিকৃত অবস্থায় স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া আছে সংকলিত অংশে স্বামী বিশ্বেশ্রয়ানন্দের টীকা ও ভূমিকাসহ বিবেকানন্দের গানের কথার পুনর্মুদ্রায়ন।

'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থের আগে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি সংকলন গ্রন্থের কথা আমরা জানি। এই প্রসঙ্গে বিদগ্ধ সঙ্গীতবিদ্ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীত সূত্রসার'

উল্লেখযোগ্য। তবে তার পাশে বিবেকানন্দের সংগৃহীত গানের এই বিরল সংকলনটির একটি আলাদা মূল্য আছে। 'সঙ্গীত কল্পতরু' তো মোট ৬৫২টি গান সংগৃহীত হয়েছে। কেবল ৫টি গান দুবার কারে মুদ্রিত হওয়ায় আমরা মোট গানের সংখ্যা ৬৪৭ বলবো। আর যদি আমরা 'বিশ্ব সঙ্গীত' সংস্করণটি মাথায় রাখি তাহলে ২০০০ সালের সেই গ্রন্থটিকে 'সঙ্গীত কল্পতরু'র পঞ্চম সংস্করণ বলা যেতে পারে।

বহুদিন আগে প্রচারিত 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থটিকে আমরা সঙ্গীত পিপাসু গবেষক এবং সাধারণ মানুষের কাছে এক আকর গ্রন্থ হিসাবে তুলে দিতে পারবো। এই গ্রন্থের মূল সংগ্রাহক হিসাবে নরেন দত্ত প্রকৃত পরিশ্রম করে সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। এই সংকলনের জন্য তিনি ৯০ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। এই ভূমিকাটি পড়লে আমরা বুঝতে পারবো যে সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তাঁর কতোখানি দখল ছিল। কেবল হিন্দুস্থানী বা কর্নাটকী সঙ্গীত নয়, বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্পর্কেও প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সঙ্গীত পরিদর্শন প্রসঙ্গে তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন।

এই সংকলন গ্রন্থের সব থেকে আকর্ষণীয় বিষয় হল যে স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু শ্রেণী ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর গানকে এই সংকলনভূক্ত করেছেন। যদিও এটি মূলতঃ বাংলায় গানের সংকলন কিন্তু এখানে সংস্কৃত পদ, হিন্দি ভজন, মৈথিলী পদ, ওড়িয়া গান, অসমীয়া গান এবং সাঁওতালী গান ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে এই গ্রন্থে আঞ্চলিক সঙ্গীত হিসাবে বাউল,চৈতী বা কীর্তন গান স্থান পেয়েছে। কিন্তু পল্লীগীতি বা গ্রাম্য গীতি স্থান পায়নি। এই গ্রন্থে এমন কিছু গান সংকলিত হয়েছে যাদের রচয়িতার নাম পাওয়া যায়না। ঊনিশ শতকে যাঁরা গীতিকার হিসাবে বিশেষ খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের গানের পাশাপাশি একেবারে অজানা অচেনা গীতিকারদের অসাধারণ কিছু গান স্বামী বিবেকানন্দ এই গ্রন্থে চয়ন করেছেন। এইসব ব্যক্তিরা গীতিকার হিসাবে কতোখানি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা আমরা জানি না, কিন্তু গবেষক এবং সংকলক হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের গান সংকলন করে একটি অত্যন্ত মূল্যবান কাজ করেছিলেন। এই তালিকাতে আছেন চন্দ্রকান্ত ন্যায়রত্ন, মহারাজা শিবচন্দ্র রায়, মির্জা হাসেন আলি, সৈয়দ আজিজ রহমান খোন্দকার, মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ ভুপ।

স্বামী বিবেকানন্দ শুধুমাত্র কৃষ্ণনাগরিক বা কলকাতার চলিত বাংলায় লেখা সঙ্গীত সন্নিবেশ করেছেন তা নয়—তিনি পূর্ববঙ্গের গীতিকারদের অনেকগুলি বিখ্যাত গানও 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থে সংযোজন করেছেন।

গান সম্পর্কে এবং গানের শিল্প শৈলি নিষ্পত্তির বিষয়ে তাঁর ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা

ছিল। এই গ্রন্থে ১৭৯ জন গীতিকারের নানা ঢঙের নানা রসের গান স্থান পেয়েছে। তিনি যে কতোখানি অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের মানুষ ছিলেন তা জানা যায় যে এই সঙ্গীতে তিনি শ্যামাসঙ্গীতের পাশাপাশি ইসলাম গান, খ্রীস্টীয় গান এমনকি ক্রুসেডের গানকেও সংযোজিত করেছেন। বিবেকানন্দের গ্রন্থের মৌলিক পরিকল্পনায় যে পদ্ধতিতে গানগুলি সংযোজন করেন তাকে ৭টি পর্যায়ে বিন্যস্থ করা যায়। এই পর্যায়গুলি হল—জাতীয়, ধর্ম বিষয়ক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক, প্রণয় ও বিবিধ সঙ্গীত। তবে এই বিভাজন যে সবসময় ঠিকমতো রাখা হয়েছে তা বলা সম্ভব হয় না। এই অসামান্য সংকলন গ্রন্থটি সম্পাদনা করে স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার লক্ষ লক্ষ সঙ্গীত পিপাসু মানুষকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

তবে এই গ্রন্থে বেশকিছু জনপ্রিয় গান অন্তর্ভুক্ত হয়নি, অবশ্য এই গানগুলি বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে একাধিকবার শুনিয়েছিলেন। যেমন—দিবানিশি করিয়া যতন, দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে কিংবা তোমাদেরই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলা ভাষায় খেয়াল গান গাওয়া উচিত কিনা তা নিয়ে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রবল মত পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। প্রসিদ্ধ গায়ক প্রয়াত তারাপদ চক্রবর্ত্তী এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি বেতারে বাঙলা খেয়াল গান পরিবেশন করেন। ভাবতে ভালোলাগে, আজ থেকে ১৩০ বছর আগে 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ তাঁর সংস্কারবিহীন মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছিলেন—'গায়ক মণ্ডলীর বিশ্বাস এই যে, হিন্দী ভাষা না হলে তা গীত হলো না। অনেক গায়ক কেবল ভাষা বাংলাতে গীত বলে লজ্জার মনে করেন। ওস্তাদ মণ্ডলী অবজ্ঞা করবেন এই ভয়ে তাঁরা কুণ্ঠিত হন। কেন বাংলা খেয়াল হবে না? ব্রাহ্ম সমাজ থেকে যে সমস্ত বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হয়েছে, তাকি কোনো অংশ হিন্দী ভাষায় রচিত ধ্রুপদ অপেক্ষা মন্দ?'

স্বামীজী দৃঢ়ভাবে বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর এই অকুতোভয় মনোভাব আমাদের অবাক করে দেয় বইকি।

বিবেকানন্দের সঙ্গীত প্রীতি সম্পর্কে তাঁর বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন—'নরেন্দ্র তখন তাহার পিত্রালয়ে দুই বেলা কেবল আহার করিতে যান, আর সমস্ত দিবারাত্র নিকটে রামতনু বসুর গলিতে মাতামহীর বাড়িতে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করেন। নরেন্দ্র আজ মনোনিবেশ পূর্বক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় কোন বন্ধুর আগমন হইলে, বেলা ১১টা আহারাদি করিয়া নরেন্দ্র পাঠ করিতেছিলেন। বন্ধু আসিয়া নরেন্দ্রকে বলিলেন, 'ভাই রাত্রিরে পারিস এখন দুটো গান গা।' অমনি নরেন পড়িবার বই মুড়িয়া একাধারে ঠেলিয়া রাখিলেন। তানপুরার গুটির তার ছিঁড়িয়া